পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

[বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী বিশেষত বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও দেশে মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে চলতি অর্থবছরে রেপো ও রিভার্স রেপো হার তিন দফায় ১৭৫ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬.২৫ শতাংশ ও ৪.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। একইসাথে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে সিআরআর এবং এসএলআর উভয়ই ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ১৯ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এসময় কতিপয় ব্যাংক ঋণ-আমানত অনুপাতের সীমা অতিক্রম করায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং প্রতিরোধমূলক তদারকি ব্যবস্থা চালু করাসহ জুন, ২০১০ থেকে ব্যাংকগুলো পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) অনুসরণ করছে কিনা পরিপালনে নজরদারিও জোরদার করে। তবে অভ্যন্তরীণ ঋণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ডিসেম্বর, ২০১০ হতে ব্যাংকগুলো কিছুটা তারল্য ঝুঁকিতে পড়ে। মুদ্রাবাজারের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দিয়ে আসছে। বছরভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ২১.৬৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৯০ শতাংশ। এসময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষের ১৯.৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৩৪ শতাংশে পৌঁছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথমার্ধে পুঁজিবাজারের মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও জানুয়ারি ২০১১ থেকে পুঁজিবাজারের অস্থিরতা দেখা দেয় এবং মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের ব্যাপক পতন ঘটে। বাজার সংশোধন (market correction) করে পুঁজিবাজারে সাধারণ জনগণের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।]

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে ঋণ প্রবাহ সহজ করে বাজারে পর্যাপ্ত তারল্য পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক তারল্য নিয়ন্ত্রণ (liquidity mop-up)-এর উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু, এসময়ে মুদ্রা ও ঋণ যোগানের পর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও ঋণ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে বাজারে অতিরিক্ত তারল্যের সৃষ্টি হয়। আন্তঃব্যাংক কলমানি (call money) সুদের ভারিত গড় হার এক শতাংশেরও নীচে নেমে আসে। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত তারল্য কিছুটা তুলে নেয়ার লক্ষ্যে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল পুনরায় চালু করার পাশাপাশি ২০০৯-১০ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে রিভার্স রেপো কার্যক্রমও শুরু করে এবং রিপো ও রিভার্স রিপোর সুদের হার ২০০ বেসিস পয়েন্টস্ হ্রাস করে যথাক্রমে ৪.৫ শতাংশ এবং ২.৫ শতাংশ নির্ধারণ করে। তবে, গত অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হওয়ায় অতিরিক্ত তারল্যের একটা অংশ বেসরকারি খাতের ঋণ যোগান ও আমদানি ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদের ভারিত গড় হারও চার শতাংশের বেশি পর্যায়ে চলে আসে। অতিরিক্ত তারল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী চাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫ মে ২০১০ থেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (Cash Reserve Requiremnt-CRR) এবং বিধিবদ্ধ

তারল্য সংরক্ষণ হার (Statutary Liquidity Ratio-SLR) ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ও ১৮.৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে।

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও দেশে মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯ আগষ্ট ২০১০ থেকে রেপো ও রিভার্স রেপো হার যথাক্রমে ৪.৫ শতাংশ ও ২.৫ শতাংশ হতে ১০০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে ৫.৫ শতাংশ ও ৩.৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। এসময় আমানত হারের প্রবৃদ্ধির তুলনায় ঋণের হারের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং কতিপয় ব্যাংক ঋণ-আমানত অনুপাতের সীমা অতিক্রম করে। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান নিয়ম-নীতির লঙ্ঘন রোধকল্পে ব্যাংকগুলোকে ঋণ ব্যবহারে সর্তক করে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং প্রতিরোধমূলক তদারকি ব্যবস্থা চালু করে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক জুন, ২০১০ থেকে ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) প্রতিপালনে নজরদারিও জোরদার করে। অক্টোবর, ২০১০ হতে স্টক এবং শেয়ারের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের জন্য প্রভিশন আবশ্যকীয়তা দ্বিগুণ করে ২ শতাংশে উন্নীত করাসহ ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে সকল ধরণের ভোক্তা অর্থায়নের জন্য ৫০ শতাংশ মার্জিন সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তা বাধ্যতামূলক করা হয়। অধিকন্তু, মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে CRR এবং SLR উভয়ই ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ১৯ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৩ মার্চ, ২০১১ এ পুনরায় রেপো ও রিভার্স রেপো হার উভয়ই ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৪ শতাংশ করা হয়। সর্বশেষ, ২৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখ থেকে রেপো ও রিভার্স রেপো হার উভয়ই ২৫ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬.২৫ শতাংশ ও ৪.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

তবে, অর্থনীতি প্রত্যাশিত উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি উলেণ্টখযোগ্য হারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে সেবা ও আয় খাতে (উদ্বৃত্ত আয়/মুনাফা/লভ্যাংশ প্রভৃতি) অর্থ পরিশোধের কারণে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ডিসেম্বর, ২০১০ হতে ব্যাংকগুলো কিছুটা তারল্য ঝুঁকিতে পড়ে। উলেণ্টখ্য, অনুৎপাদনশীল খাতে যেমন ভোগ্যপণ্য, বিলাস দ্রব্য, রিয়েল এষ্টেট ও পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত বিনিয়োগও তারল্য সমস্যা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। তবে, মুদ্রাবাজারের বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দিয়ে আসছে। মার্চ ২০১১ মাসে শেষে ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য (excess liquidity) দাঁড়িয়েছে ২৭,০৮৭ কোটি টাকা।

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা (Trends in Monetary Aggregates)

২০১০-১১ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি মাসে বছরভিত্তিতে (year-on-year) সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money-M_1) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money-M_2) প্রবৃদ্ধি কিছুটা এবং রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money-RM)-এর প্রবৃদ্ধি উলেণ্টখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এসময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা) বৃদ্ধির কারণে সংকীর্ণ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তলবি আমানত ও মেয়াদি আমানত উভয়ই হ্রাসের ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি সামান্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক হারে হ্রাস পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা
(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-১০	ফেব্রুয়ারি , ২০১০-১১
সংকীর্ণ মুদ্রা	২০.৪৭	১৭.৬২	১৮.২৩	১১.৯৯	৩২.৪৬	২৩.৪৪	২৭.৯৫

ব্যাপক মুদ্রা	১৯.৩০	১৭.০৬	১৭.৬৩	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৯০	২১.৬৬
রিজার্ভ মুদ্রা	২৭.১২	১৭.৯০	১৯.৭৮	৩১.৪৫	১৬.০৩	২৫.৭০	২০.৭৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম$_১$)

সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে ৩২.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৯৯ শতাংশ। বছরভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭.৯৫ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৪৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা) বৃদ্ধি পায় ২৪.৮ শতাংশ এবং তলবি আমানত ৩১.৭৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৬.০৯ শতাংশ ও ৩৩.৬৯ শতাংশ।

ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$)

ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে ২২.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.১৭ শতাংশ। বছরভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ২১.৬৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৯০ শতাংশ। এসময়ে মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৯.৮১ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে মেয়াদি আমানতের বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৪৫ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার স্থিতি ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে (জুন'১০ শেষে) ছিল ৩,৬৩,০৩১.২ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে দাঁড়িয়েছে ৪,০৬,৭৮৪.৯ কোটি টাকা। সারণি ৫.১-এ মুদ্রা ও ঋণ যোগানের উপাদানসমূহের তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ ব্যাপক মুদ্রা যোগান পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহের গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০০৮	জুন, ২০০৯	জুন, ২০১০	ফেব্রুয়ারি'১০	ফেব্রুয়ারি'১১
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	**৩৭৩১৭.৯**	**৪৭৪৫৯.৪**	**৬৭০৭৩.৭**	**৬৪৭৫৯.৩**	**৬৭৭৭৪.২**
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	**২১১৪৭৭.০**	**২৪৯০৪০.৪**	**২৯৫৯৫৭.৫**	**২৬৯৬১১.৮**	**৩৩৯০১০.৭**
ক. অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৪৮৬৭৭.৩	২৮৮৫৫২.৪	৩৪০২১৩.৬	৩১১৭৯১.৩	৩৯৪২২১.৬
ক.১. সরকারি খাত (নীট)	৪৬৯০৯.১	৫৮১৮৫.২	৫৪৩৯২.৩	৪৯৩৯৬.৪	৫৬০৭২.৮
ক.২. রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১১৬৩২.৪	১২৪৩৯.৭	১৫০৬০.৭	১৪৩৯২.৩	১৯৮৬৭.০
ক.৩. বেসরকারি খাত	১৯০১৩৫.৮	২১৭৯২৭.৫	২৭০৭৬০.৬	২৪৮০০২.৬	৩১৮২৮১.৮
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৭২০০.১	-৩৯৫১২.০	-৪৪২৫৬.১	-৪২১৭৯.৫	-৫৫২১০.৯
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান	**৫৯৩১৪.৪**	**৬৬৪২৬.৯**	**৮৭৯৮৮.৩**	**৭৫৯৩৬.৭**	**৯৭১৬২.৭**
ক. জনসাধারনের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৩২৬৮৯.৯	৩৬০৪৯.২	৪৬১৫৭.১	৪১৬০২.৪	৫১৯১৮.২
খ. তলবি আমানত*	২৬৬২৪.৫	৩০৩৭৭.৭	৪১৮৩১.২	৩৪৩৩৪.৩	৪৫২৪৪.৫
৪. মেয়াদি আমানত	১৮৯৪৮০.৫	২৩০০৭২.৯	২৭৫০৪২.৮	২৫৮৪৩৪.৪	৩০৯৬২২.২
৫. ব্যাপক মুদ্রা [(১)+(২)] অথবা [(৩)+(৪)]	**২৪৮৭৯৪.৯**	**২৯৬৪৯৯.৮**	**৩৬৩০৩১.২**	**৩৩৪৩৭১.১**	**৪০৬৭৮৪.৯**
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৫.০৭	২৭.১৮	৪১.৩১	৮৬.৪৭	৪.৬৬
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৮.১০	১৭.৭৬	১৮.৮৪	১২.৫৩	২৫.৭৪
ক. অভ্যন্তরীণ ঋণ	২০.৯৫	১৬.০৩	১৭.৮৯	১৩.৩৩	২৬.৪৪
ক.১. সরকারি খাত (নীট)	৩০.৪১	২৪.০৪	-৬.৫২	-৭.২১	১৩.৫২
ক.২. রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	-৩৩.৩৬	৬.৯৪	২০.৭৭	-০.০৪	৩৮.০৪
ক.৩. বেসরকারি খাত	২৪.৯৪	১৪.৬২	২৪.২৪	১৯.৫২	২৮.৩৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৩৯.৭৭	-৬.২১	-১১.৮৯	-১৮.৬৬	-৩০.৮৯
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান	**১৮.২৩**	**১১.৯৯**	**৩২.৪৬**	**২৩.৪৪**	**২৭.৯৫**
ক. জনসাধারনের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	২২.৬৯	১০.২৮	২৮.০৪	১৬.০৯	২৪.৮০

খ. তলবি আমানত*	১৫.৪৫	১৪.১০	৩৭.৭০	৩৩.৬৯	৩১.৭৮
৪. মেয়াদি আমানত	১৭.১১	২১.৪২	১৯.৫৫	২১.৪৫	১৯.৮১
৫. **ব্যাপক মুদ্রা**	**১৭.৬৩**	**১৯.১৭**	**২২.৪৪**	**২১.৯০**	**২১.৬৬**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক * অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আমানতসহ।

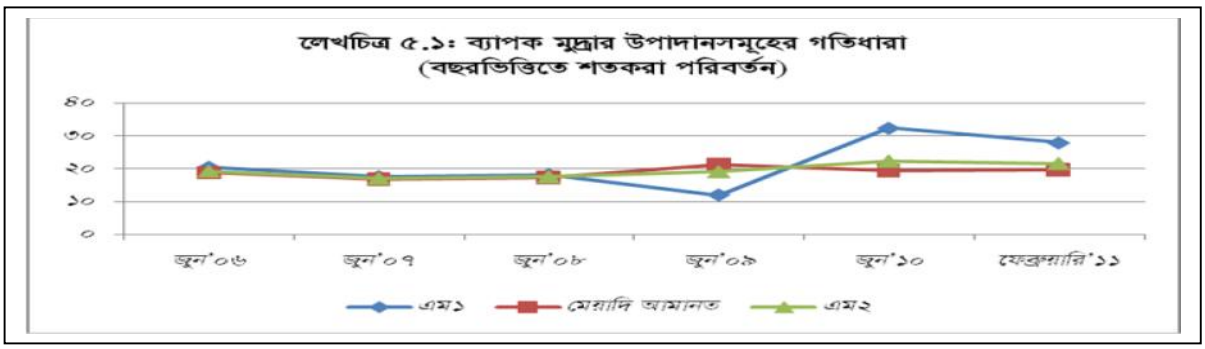

লেখচিত্র ৫.১-এ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির উলেণ্টখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন থেকে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা) এবং তলবি আমানতের অংশ বেড়েছে ও মেয়াদি আমানতের অংশ হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৫.২)।

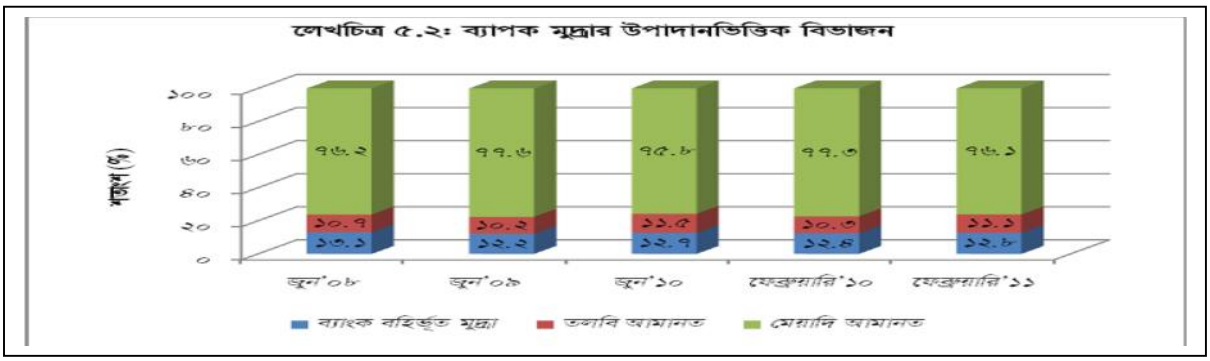

অভ্যন্তরীণ ঋণ

বার্ষিকভিত্তিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৮৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.০৩ শতাংশ। এসময়ে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৪.৬২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.২৪ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে সরকারি খাতে নীট ঋণ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২৪.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬.৫২ শতাংশে হ্রাস পায়। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ২৬.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩৩ শতাংশ। এসময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে ১৯.৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৩৪ শতাংশে পৌঁছে যা মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন; কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ঋণ এবং মেয়াদি শিল্প ঋণসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে জোরালো অবদান রাখে। বেসরকারি খাতে ঋণের এ প্রবৃদ্ধি প্রধানত উৎপাদনশীল খাতগুলোতে হলেও ঋণের কিছু অংশ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

রিজার্ভ মুদ্রা

বার্ষিকভিত্তিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.০৩ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৩১.৪৫ শতাংশ। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ৪১.৫২ শতাংশ হলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাস পায় ২৬.১৩ শতাংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে নীট বৈদেশিক সম্পদের এ প্রবৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে সন্তোষজনক রাজস্ব

আহরণ ও সঞ্চয় পত্র থেকে সরকারের অর্থায়ন বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের নীট ঋণ গ্রহণ ঋণাত্মক হয়। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষের রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষের প্রবৃদ্ধি ২৫.৭ শতাংশের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ২০.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের শ্লথ গতি ফলে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ৮৪.৩১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ১.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০৩.১৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে ছিল ঋণাত্মক ৪৭.০৩ শতাংশ। তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাস শেষে ২০৩.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা রাখে। সারণি ৫.৩-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও সারণি ৫.৪-এ এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হলো।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদান

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০০৮	জুন, ২০০৯	জুন, ২০১০	ফেব্রুয়ারি, ২০১০	ফেব্রুয়ারি, ২০১১
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৩৫৬৪৮.৫	৩৯৪৪৮.৭	৫০৪৬৫.৪	৪৫৯৫৫.৭	৫৭৩৪৪.৩
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১৭০৩৪.২	২৯৮০০.২	২৯৮৩৫.৫	২৭০২৪.৪	৩০৭৭৯.১
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি*	১০৬.৯	১৪১.২	২০৯.৪	১৩৮.৯	১৮৪.২
৪. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)+(৩)]	**৫২৭৮৯.৬**	**৬৯৩৯০.১**	**৮০৫১০.৩**	**৭৩১১৯.০**	**৮৮৩০৭.৬**
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৯.৭৮	১০.৬৬	২৭.৯৩	১৯.০৯	২৪.৭৮
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৩.৮৩	৭৪.৯৪	৩৫.৩০	৩৮.৬৯	১৩.৮৯
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি*	১১.৮৯	৩২.০৯	৪৮.৩০	৫১.১৪	৩২.৬১
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	**৭৩.২৬**	**৩১.৪৫**	**১৬.০৩**	**২৫.৭০**	**২০.৭৭**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

* অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আমানতসহ।

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০০৮	জুন, ২০০৯	জুন, ২০১০	ফেব্রুয়ারি, ২০১০	ফেব্রুয়ারি, ২০১১
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩২৮৩৫.৮	৪৩২৪৪.৯	৬১১৯৮.১	৫৯৩৭১.৩	৬০৩৭৩.০
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [(ক)+(খ)]	১৯৯৫৩.৮	২৬১৪৫.২	১৯৩১২.২	১৩৭৪৭.৭	২৭৯৩৪.৬
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৩৫৯২৭.২	৩৮৬৩২.৪	৩১৪৯২.৯	২৪১৪৭.৯	৪০৯৩৬.৯
ক.১. সরকারের নিকট	২৫৯৯৭.৩	২৮৯৫৫.৫	২২৩২০.৬	১৫২৮৮.৬	১৯২৫৩.৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৮৯৮.৯	৮০৮.১	৭৯৩.০	৭৯৬.৭	১৩৪৭.৩
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৭৩৩৪.২	৬৮৪৬.৭	৫৮৫২.০	৫৭৭১.০	১৭৫০৯.৬
ক.৪. অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১৬৯৬.৮	২০২২.১	২৫২৭.৩	২২৯১.৬	২৮২৬.৭
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৫৯৭৩.৪	-১২৪৮৭.২	-১২১৮০.৭	-১০৪০০.২	-১৩০০২.৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)]	৫২৭৮৯.৬	৬৯৩৯০.১	৮০৫১০.৩	৭৩১১৯.০	৮৮৩০৭.৬
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	**১৪.০০**	**৩১.৭০**	**৪১.৫২**	**৮৪.৩১**	**১.৬৯**
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	**৩১.১৯**	**৩১.০৩**	**-২৬.১৩**	**-৪৭.০৩**	**১০৩.১৯**
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	২.৯৭	৭.৫৩	-১৮.৪৮	-৩৩.৩৫	৬৯.৬০
ক.১. সরকারের নিকট	০.২৬	১১.৩৮	-২২.৯১	-৪২.৭৫	২৫.৯৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	-৪.২১	-১০.১০	-১.৮৭	-৫.১৩	৬৯.১১
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-১৩.৮৫	-৬.৬৫	-১৪.৫৩	-১৪.৯৫	২০৩.৪১
ক.৪. অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৭.৬৬	১৯.১৭	২৪.৯৮	২১.০৪	২৩.৯১

খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১৭.৭৯	২১.৮৩	২.৫৪	-১.২৭	-২৫.১৪
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	**১৯.৭৮**	**৩১.৪৫**	**১৬.০৩**	**২৫.৭০**	**২০.৭৭**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আমানতসহ।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০০৯-১০ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০০৯ শেষের ৪.২৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১০ শেষে ৪.৫১ এ দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি রির্জার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি হলেও প্রবৃদ্ধির ব্যবধান কমে আসায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১০-এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি ২০১১ মাস শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৬১ এ দাঁড়ায়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে ২.০৭ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে ১.৯১-এ দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রার আয় গতি সামান্য বেড়ে ১.৯২-এ দাঁড়িয়েছে। উলেণ্টখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষে মুদ্রার আয় গতি হ্রাস পায় ৬.১২ শতাংশ। ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৫.৪৯ ও ৮.০২ শতাংশ। বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetization) এবং আর্থিক গভীরতা (financial deepening) নির্দেশ করে। লেখচিত্র ৫.৩-এ ১৯৯০-৯১ অর্থবছর থেকে জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো। উলেণ্টখ্য, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার স্থিতি ছিল জিডিপি'র ২২.৬৩ শতাংশ যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৫২.৪৩ শতাংশে।

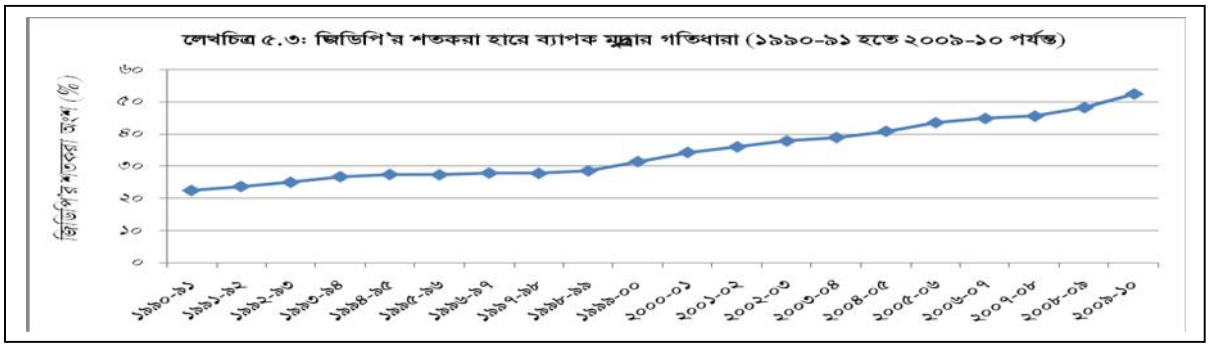

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত। আর্থিক বাজারের মধ্যে রয়েছে ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (State-owned Commercial Banks-SCBs), ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৪টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ২৯টি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক) তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৭টি তফশিলি ব্যাংক ৭,৬৬৪টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩,৪০৪টি, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ২,৮১৬টি, বিদেশি ব্যাংকের শাখা ৬২টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১,৩৮২টি। এছাড়াও তফসিলভুক্ত নয় এমন ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। এপ্রিল ২০১১ মাসে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' নামে একটি নতুন

ব্যাংক কার্যক্রম শুর" করেছে। ফেব্র"য়ারি ২০১১ শেষে ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ যথাক্রমে সারণি ৫.৫ ও লেখচিত্র ৫.৪ এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণিঃ ৫.৫: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো
(ফেব্র"য়ারি ২০১১ পর্যন্ড়)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	৩৪০৪	২৮.০৬	২৫.৬২
বিশেষায়িত	৪	১৩৮২	৬.০১	৪.৪৪
বেসরকারি	৩০	২৮১৬	৫৯.৩৪	৬৩.৫০
বিদেশি	৯	৬২	৬.৫৯	৬.৪৪
মোট	৪৭	৭৬৬৪	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

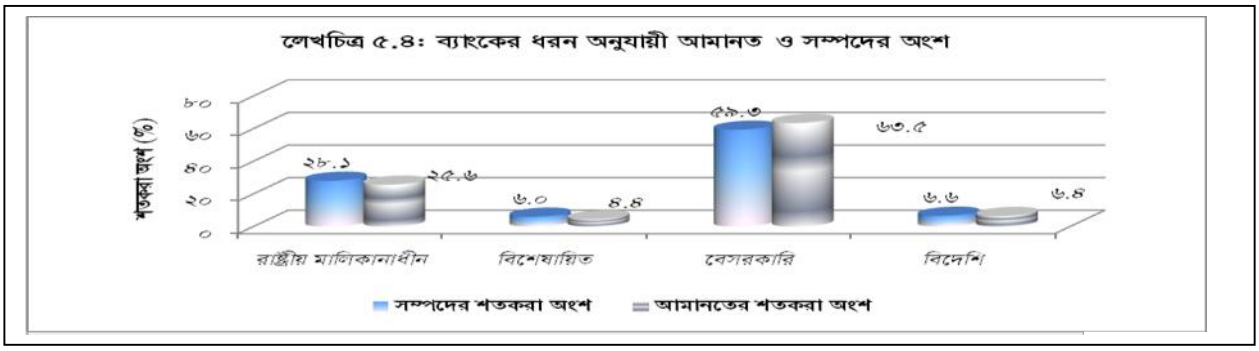

মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, আয়-ব্যয় অনুপাত প্রভৃতির আলোকে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলো তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও ব্যাংক শাখার বিস্ড়ারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো সাধারণ মানুষের কাছে অধিকতর ব্যাংকিং সেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ৪,৩৯৭টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ফেব্র"য়ারি, ২০১১ শেষের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে বিদেশি ব্যাংকগুলোর কোন শাখা নেই এবং স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট শাখার মাত্র ৩৫.৯ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্ড়রে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মোট শাখার ৬৩.৪৮ শতাংশ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক এর মোট শাখার ৮৮.৬৪ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার চিত্র সারণি ৫.৬ এবং লেখচিত্র ৫.৫-এ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৬: ব্যাংক শাখার বিস্ড়ার
(ফেব্র"য়ারি ২০১১ পর্যন্ড়)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			শাখার সংখ্যা (শতাংশে)		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	১২৪৩	২১৬১	৩৪০৪	৩৬.৫২	৬৩.৪৮	১০০
বিশেষায়িত	৪	১৫৭	১২২৫	১৩৮২	১১.৩৬	৮৮.৬৪	১০০
বেসরকারি	৩০	১৮০৫	১০১১	২৮১৬	৬৪.১০	৩৫.৯০	১০০
বিদেশি	৯	৬২	০	৬২	১০০	-	১০০
মোট	৪৭	৩২৬৭	৪৩৯৭	৭৬৬৪	৪২.৬৩	৫৭.৩৭	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

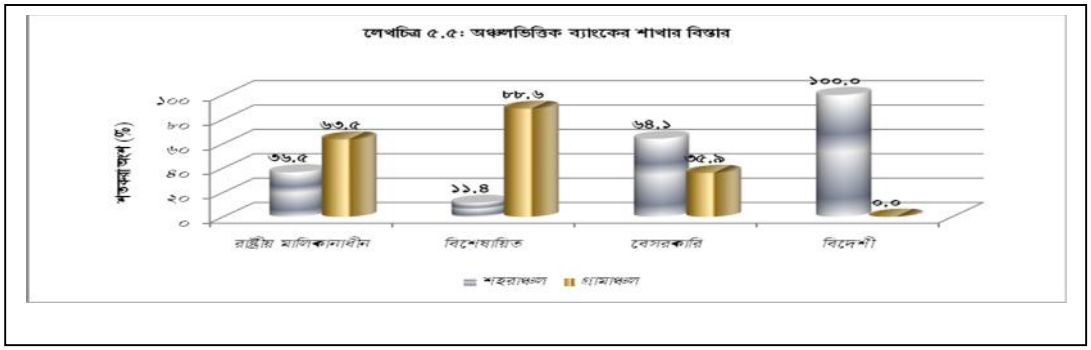

২০১০ সালে আর্থিক খাতের সূচকসমূহে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে ব্যাংকগুলোর মুনাফা ও উপার্জনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলোর সম্পদের উপর আয় হার (Return on Asset-ROA) ডিসেম্বর ২০০৯ শেষের ১.৩৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১০ এ ১.৭৮ শতাংশে (কর ও প্রভিশন পূর্ববর্তী মুনাফার উপর) দাঁড়ায়।

দেশের আর্থিক খাতে অধিকতর দক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য চলমান সংস্কার কার্যক্রম ২০১০-১১ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহকে অধিকতর ঝুঁকি-সংবেদনশীল এবং ব্যাংকিং শিল্পকে অধিকতর অভিঘাত (shocks) মোকাবেলায় সক্ষম ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০০৮ এ ব্যাসেল-২ এর আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত সংশোধিত মূলধন রূপরেখা জারী করে। জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাংকিং খাতে Regulatory Requirement হিসেবে মূলধন রূপরেখার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ব্যাসেল-২ কাঠামোতে সুষ্ঠু পদার্পণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ব্যাসেল-১ এর পাশাপাশি ব্যাসেল-২ এর আওতায় তফসিলি ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা বিষয়ক পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (trial run) সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংকগুলোর ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাসেল-১ এর আওতায় শুধুমাত্র ঋণ ঝুঁকি বিবেচনা করা হতো। ব্যাসেল-২ এর আওতায় ঋণ ঝুঁকি (credit risk), বাজার ঝুঁকি (market risk) ও পরিচালন ঝুঁকি (operational risk) বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাসেল-২ এর আওতায় তদারকিমূলক পুনর্নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া (Supervisory Review Process) এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত মূলধন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মার্কেট ডিসকেপ্লিনার এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উন্মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম ৮ শতাংশ, ১ জুলাই ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত ন্যূনতম ৯ শতাংশ এবং ১ জুলাই ২০১১ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য ন্যূনতম ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ন্যূনতম চলতি মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য ব্যাংক কোম্পানীসমূহকে আগষ্ট ২০১১ পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়েছে। তফসিলি ব্যাংকগুলোর ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল ৯.৩১ শতাংশ, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার হারের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (non-bank financial institutions) দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহন ও তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পুঁজিবাজারেও বিনিয়োগ করে থাকে। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৩০টি। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ১০৯টি শাখা ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৬০৫.৪৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন হচ্ছে ১,৪৮৩.২২ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদ ও আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৩,১৬১.৩৬ কোটি টাকা ও ৯,০৮৫.২৬ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত শেয়ার ও সিকিউরিটিজে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩৮৯.৭৭ কোটি টাকা। ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি এর আদায় জোরদারকরণের মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংক এর মতো অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং এর নিয়ম চালু রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট ঋণ ও লীজের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,৮০৯.৪২ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ ও লীজের হার ৫.৯২ শতাংশ। সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যাংক এর ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও আগামী জানুয়ারি ২০১২ থেকে ব্যাসেল-২ চুক্তি (Basel II Accord) বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ব্যাসেল-২ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়োপযোগী অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে এশটি কর্মপরিকল্পনা/পথনকশা

(Road map) তৈরি করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করা হয়েছে। উলেণ্টখ্য, শেয়ারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ তাদের মোট পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না।

সুদের হার

২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষে এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম দিকে মুদ্রা বাজারে তারল্য পরিস্থিতি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরায় রিভার্স রেপোর কার্যক্রম শুরু করে। এসময়ে রেপোর (১-২ দিন মেয়াদি) সুদের হার সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর ৮.৫ শতাংশ থেকে নভেম্বর ২০০৯-এ ৪.৫ শতাংশে নেমে আসে এবং এ হার জুলাই ২০১০ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে রিভার্স রেপোর (১-২ দিন মেয়াদি) সুদের হার মার্চ ২০০৯ এর ৬.৫ শতাংশের তুলনায় অক্টোবর ২০০৯-এ ২.৫ শতাংশে নেমে আসে এবং জুলাই ২০১০ পর্যন্ত এ হার অব্যাহত থাকে। মুদ্রা বাজারে তারল্য পরিস্থিতির ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক কলমানির সুদের ভারিত হার জুলাই ২০১০-এ ৩.৩৩ শতাংশে পৌঁছে যা জুলাই ২০০৯-এ ১.১ শতাংশ ছিল।

মূল্যস্ফীতির চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বাজারে মুদ্রা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আগষ্ট ২০১০ থেকে রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার ১০০ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৫.৫ শতাংশ ও ৩.৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। এতে বাজারে তারল্য প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পায় এবং আন্তঃব্যাংক কলমানির ভারিত সুদের হার ৬.৩৬ শতাংশে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতির চাপ উর্ধ্বমুখী থাকার প্রেক্ষিতে রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার গত ১৩ মার্চ ২০১১ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্টস্ এবং সর্বশেষ ২৭ এপ্রিল ২০১১ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্টস্ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬.২৫ শতাংশ ও ৪.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া ৯১-দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারিত সুদের হার জুলাই ২০১০-এ ২.৪৩ শতাংশ থেকে মার্চ ২০১১ তে ৫.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৮২-দিন মেয়াদি এবং ৩৬৪-দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারিত সুদের হার জুলাই ২০১০ থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ২.৪ পাসেন্টেজ পয়েন্টস্ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারী বিলসমূহের (৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর ও ২০-বছর) ভারিত সুদের হারও এসময়ে বৃদ্ধি পেলেও তা ১ শতাংশের নীচে রয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সিদ্ধান্ড় এবং উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে সুদের হার হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে ১৯ এপ্রিল ২০০৯ থেকে কৃষিখাত, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ, গৃহায়ন এবং বাণিজ্যে অর্থায়ন খাতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ১৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। মন্দা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং কতিপয় ব্যাংক কর্তৃক আমানতের সুদের হার বৃদ্ধির প্রবণতা প্রেক্ষাপটে সুদের হারকে বাজার ভিত্তিক করার লক্ষ্যে কৃষি ও মেয়াদি শিল্প ঋণ ব্যতীত অন্যন্য খাতে সুদের হারের উচ্চ সীমা তুলে নেয়া হয়েছে। তবে চলতি মূলধনসহ কতিপয় খাতে সুদের হার যাতে যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর ওপর নৈতিক চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যে সুদের হার নির্ধারণে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের সুদ হার প্রতিবেদন মাসিকভিত্তিতে পত্রিকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। তবে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং এসব পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে ভোজ্য তেল (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত), চিনি, (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত), ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, খেজুর এবং ফলমূল আমদানি অর্থায়নে সুদের হার সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, ২০০৪ তারিখ হতে রপ্তানি ঋণের ওপর ৭ শতাংশ সুদ হার নির্ধারিত রয়েছে। সারণি ৫.৭-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাংক ঋণের ভারিত সুদের হার দেখানো হলো:

সারণি ৫.৭-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাংক ঋণের ভারিত সুদের হার (ডিসেম্বর, ২০১০)

	সকল ব্যাংক	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	বেসরকারি		বিশেষায়িত
			স্থানীয়	বিদেশি	
সকল ঋণ	১১.১৯	৯.১৮	১২.০২	১১.৮৪	৯.১২
কৃষি, মৎস্য ও বন	৮.৩২	৫.৯০	১২.৭৫	১১.৬৩	৮.৩৩
শিল্প (চলতি মূলধনে অর্থায়ন ব্যতীত)	১০.৯২	৯.৩৪	১১.৮০	১১.৬৭	৮.০৬
চলতি মূলধনে অর্থায়ন	১১.২১	৯.৫০	১২.০১	১১.০৫	১১.৩১
নির্মাণ	১০.৪৩	৫.৩৩	১২.২০	১২.৩৬	৯.৩১
ওয়াটার ওয়ার্কস ও স্যানিটারী সার্ভিস	১৩.০২	১৩.০০	১৩.০৩	-	০.০০
পরিবহণ ও যোগাযোগ	১১.৭৮	৯.৮৮	১২.১৯	১১.০৩	১০.১০
সংরক্ষণ	৯.১০	৫.২২	১১.৫৮	১২.৪৭	৯.৩৯

ব্যবসা	১১.৮৬	১০.২৭	১২.৩৪	১১.৮৭	১১.৫২
বিবিধ	১১.২৫	৯.৭	১১.০৮	১৩.৪২	৮.৪৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

ভারিত গড় (weighted average) ঋণ প্রদানের সুদের হার জুন ২০০৯-এ ১৩.৪৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১০-এ ১২.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময়ে ভারিত গড় আমানতের সুদের হার ৮.২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে জুন ২০০৯-এ সুদের হারের বাপ্তি (interest rate spread) ৫.২ শতাংশ থেকে জুন ২০১০-এ ৪.৯৭ শতাংশে হ্রাস পায়। ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ মাসে ভারিত গড় ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১২.৫২ শতাংশ ও ৭.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে এসময়ে সুদের হারের ব্যাপ্তি জুন ২০১০-এর তুলনায় প্রায় একই রয়েছে। লেখচিত্র ৫.৬-এ ভারিত গড় ঋণের সুদের হার (Weighted Average Lending Rate) ও ভারিত গড় আমানতের সুদের হারের (Weighted Average Deposit Interest Rate) গতিধারা দেখানো হলো।

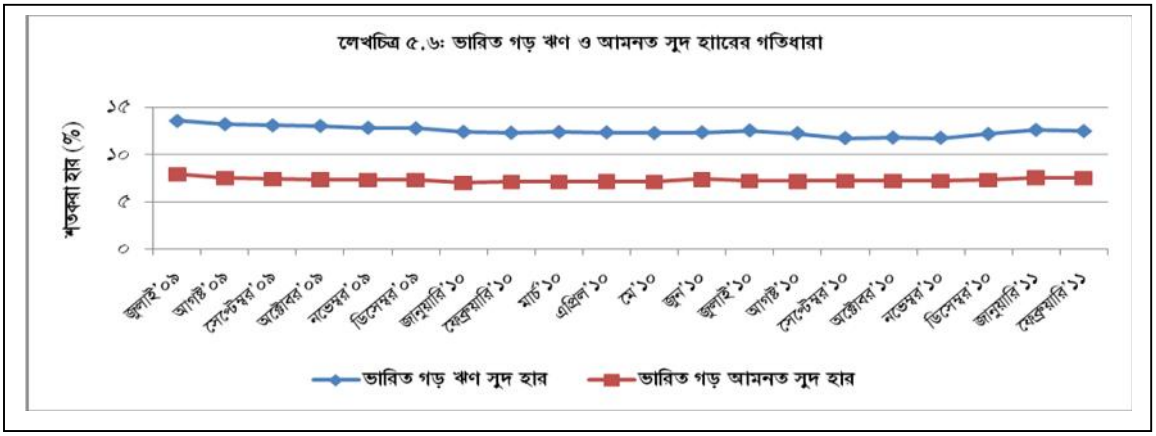

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে 'অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩' কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ড় কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্ড়বায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উলেণ্টখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উলেণ্টখ্য, ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ড় অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ১,১১,৩৪৮টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ৩৫,৪৮৬.৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে মীমাংসিত মামলা ৭৫,৫১৩টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫,৯৪২.১৪ কোটি টাকা।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

আন্ড়র্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সালের শেষার্ধ থেকে 'সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট' বাস্ড়বায়ন করছে, যা সংশোধিত মেয়াদ অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ড় চলবে। দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং খাতের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কর্তৃপক্ষ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

- আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ

- পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন (বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম পুনঃবিন্যাস, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আধুনিকায়ন, অফিস লে-আউট ও অফিস আধুনিকায়ন, ভিডিও কনফারেন্সিং, অটোমেশন, আইটি ল্যাব স্থাপন, মানব সম্পদ উন্নয়ন)
- সামর্থ্য বৃদ্ধি (গবেষণা বিভাগ শক্তিশালীকরণ, প্রবিধি ও তদারকি শক্তিশালীকরণ এবং একাউন্টস্ এন্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড শক্তিশালীকরণ)।

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে (ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত) অর্জিত কতিপয় অগ্রগতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- দেশের ব্যাংকিং খাতের আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাত সংশিণ্টষ্ট বিদ্যমান আইনসমূহ (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ব্যাংক কোম্পানী আইন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন) পর্যালোচনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে আইনের খসড়াসমূহ পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ অবলুপ্ত ও একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যপদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করার পাশাপাশি কোন কোন বিভাগের কার্যপদ্ধতিও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ব্যাংকের সার্বিক মিশন ও ভিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিটি বিভাগের লক্ষ্য (objective) ও প্রধান কর্মকৃতির নির্দেশক (key performance indicators) নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ব্যাংকের মানব সম্পদ, আর্থিক সম্পদ এবং ভৌত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স পণ্যানিং (ইআরপি) বাস্তবায়ন প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক হিসাবারক্ষণ, মানব সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারী ও সিকিউরিটি সিস্টেম, প্রাইজবন্ড, ক্যাশিয়ার টেলার, বিনিয়োগ কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে (সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও সমঝোতা স্মারক (MOU) এর আওতায় তদারকির কাজ অব্যাহত আছে। গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নির্দেশকসমূহের পাশাপাশি কৃষি ঋণ, এসএমই এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো সমঝোতা স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি এ সকল ক্ষেত্রেও ব্যাংকগুলোর পারফরমেন্স মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উলেণ্টখ্য, রূপালী ব্যাংক লিঃ এর পুঞ্জিভূত ক্ষতিকে goodwill হিসেবে intangible asset এ রূপান্তর করার পাশাপাশি কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের (SOE) নিকট রূপালী ব্যাংক লিঃ এর পাওনা (৬৭৭.৯৩ কোটি টাকার দায়) সরকার গ্রহণপূর্বক ৫-বছর মেয়াদি সুদমুক্ত (interest free) বন্ড ইস্যুর সম্মতি দান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৬ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে ৬৭৭.৯৩ কোটি টাকার ৬, ৭ ও ৮ বছর মেয়াদি বিশেষ ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করা হয়েছে, যা ব্যাংক প্রয়োজনে তার সংবিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ অনুপাত (SLR) হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। তাছাড়া, ২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য প্রণীত এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা অব্যাহত আছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার, আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) গৃহীত এরূপ উলেণ্টখযোগ্য পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের ঝুঁকি বিবেচনায় ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক কোন স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত স্টক

ডিলার, শেয়ার ব্রোকারেজ ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত নিজস্ব পৃথক সাবসিডিয়ারী কোম্পানি বা কোম্পানীগুলোকে প্রদত্ত যে কোন ধরনের ঋণ এবং এ উদ্দেশ্যে গঠিত অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিকে প্রদত্ত যে কোন ধরনের ঋণের অশ্রেণীকৃত অংশের বিপরীতে বিদ্যমান সাধারণ প্রভিশন ১ শতাংশ থেকে ২ শতাংশে উন্নীতকরণ

- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত সংস্থাকে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যক্ষ ঋণ সুবিধা তার মোট মূলধনের ১৫ শতাংশ এর বেশি না প্রদানের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ
- ব্যাংকগুলোর দুর্বল ঋণ তদারকি ব্যবস্থার জন্য উৎপাদনশীল খাতে প্রদত্ত ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারজনিত কারণে অর্থনীতিতে উদ্ভুত নেতিবাচক প্রভাব রোধকল্পে ঋণ বিতরণোত্তর ঋণ/বিনিয়োগ এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাংকগুলোর মনিটরিং ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখার নির্দেশ প্রদান
- ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণের অননুমোদিত (unauthorized) ব্যবহার রোধকল্পে ব্যাংকগুলোকে ঋণ ব্যবহারে সর্তককরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধন (সংশোধিত রিপোর্টিং নির্দেশনা) এবং প্রতিরোধমূলক তদারকি ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি জুন ২০১০ থেকে ব্যাংকগুলো কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) পরিপালনে নজরদারি জোরদারকরণ এবং অক্টোবর ২০১০ হতে স্টক এবং শেয়ারের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের জন্য প্রভিশন আবশ্যকীয়তা দ্বিগুণ করে ২ শতাংশে উন্নীতকরণ
- জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা এবং পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় শক্তিশালী ও পরিবেশ-বান্ধব ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশদ নীতিমালা (Policy Guidelines for Green Banking) প্রণয়ন
- কোন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদানে বিদ্যমান ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির বিষয় বিবেচনা করার নিমিত্তে বিশদ নির্দেশনা সম্বলিত গাইডলাইনস (Guidelines on Enironmental Risk Management) প্রণয়ন

পুঁজিবাজার

২০০৯-১০ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও ২০১০-১১ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুন মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বাজার মূলধন দাঁড়ায় জিডিপি'র ৩৯ শতাংশ, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জুন মাস শেষে ছিল জিডিপি'র ২১.৪ শতাংশ। এসময়ে ডিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৩,০১০.২৬ থেকে ৯৮.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,১৫৩.৬৮ এ দাঁড়ায়। পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এসময়ে বাজার মূলধন ও মূল্যসূচকের উলেণ্টখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। উলেণ্টখ্য, জুন ২০০৯ এ বিও (Benificiary Owners) একাউন্টের সংখ্যা ১৪.১৫ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১০-এ দাঁড়ায় ২৫.৬৪ লক্ষে। এপ্রিল ২০১১ মাসে বিও একাউন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪.১৫ লক্ষে। ২০১০-১১ অর্থবছরের শুরুতে পুঁজিবাজারে তেজিভাব লক্ষ্য করা যায়। ডিসেম্বর ২০১০ মাস শেষে ডিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৮,২৯০.৪১-এ পৌঁছে যা, জুন ২০১০-এর তুলনায় ৩৪.৭২ শতাংশ বেশি। একইভাবে বাজার মূলধন জিডিপি'র ৪৪.১ শতাংশে পৌঁছে। জানুয়ারি ২০১১ মাসের শুরু থেকেই পুঁজিবাজারে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১২ মে ২০১১-এ ডিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৬১২.৫২-এ, যা ডিসেম্বর ২০১০ এর তুলানায় ৩০.৩ শতাংশ কম। একইভাবে বাজার মূলধন জিডিপি'র ৩৪.১৯ শতাংশে নেমে আসে। Price Earnings (P/E) Ratio জানুয়ারি ২০১১-এর ২৯.৩৫ থেকে কমে ১২ মে ২০১১-এ ১৬.৪৩ এ দাঁড়ায়।

বাজারকে যথাযথ পর্যায়ে রাখার (market correction) লক্ষ্যে সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ইত:পূর্বে বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য কয়েকটি হলো: নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা, লোন মর্জিন পুনঃনির্ধারণ, মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির বাজারে আসার সুবিধার্থে মার্চ ২০০৯ থেকে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও মূল্য নির্ধারণের সুযোগ প্রদান, তালিকাচ্যুত কোম্পানিসমূহের সিকিউরিটিজকে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ করে দিতে ডিইসিতে সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে ওভার-দি-কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট চালু করা। এছাড়া বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির

আয়োজন করা হয়। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুসাশনের উন্নতিকল্পে 'Bangladesh Institute of Capital Market' নামক একটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। পুঁজিবাজারের সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনসম্পদের উন্নয়ন এবং তদারকি কার্যক্রম আরো উন্নততর করার লক্ষ্যে এসইসি, সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে 'Improvement of Capital Market Governance Programme' নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সরকার সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত পুঁজিবাজারের অস্থিরতা কাঁটিয়ে পুঁজিবাজারের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাজারকে যথাযথভাবে পরিচালনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতির সমস্যসমূহ চিহ্নিত করে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পুঁজিবাজারে তারল্যপ্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে আইসিবি'র উদ্যোগে ৫,০০০ কোটি টাকার 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি মেয়াদবিহীন (open end) মিউচ্যুয়্যাল ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও ট্রেডিং কার্যক্রম পৃথক করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন (Demutulization of stock exchange) এর কাজ শুরু হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে পুঁজিবাজারে সংঘটিত ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া, সরকার অবিলম্বে, স্বল্পমেয়াদে এবং মধ্যমমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বাজার পরিস্থিতি

প্রাথমিক ইস্যু

জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত সময়ে পুঁজিবাজারে ১৩টি কোম্পানিতে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৮১৭ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ) এবং আরো ৩টি কোম্পানিকে ৬৯৬.১ কোটি টাকা আইপিও এর মাধ্যমে উত্তোলনের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এ পুঁজি আহরণের বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৭,০৮৯.৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য কোম্পানি প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের গড় আবেদনের পরিমাণ ছিল তাদের সাধারণ পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ৮.৬৮ গুণ, যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর ব্যাপক চাহিদার পরিচায়ক।

সেকেন্ডারি বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১০ সালের জুন মাসের ৪৫০ টি থেকে বেড়ে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে ৪৮৬টিতে দাঁড়ায়। এপ্রিল ২০১১ মাস শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭,৮৪৬.০ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১০ এর ৬০,৭২৬.৩ কোটি টাকা অপেক্ষা ২৮.১৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৭০,০৭৪.৫ কোটি টাকা, যা এপ্রিল ২০১১ শেষে ২.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৭,২১৯.৩ টাকায়। ২০০৫ সাল থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণী সারণি ৫.৮-এ দেখানো হলো:

সারণি ৫.৮: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২৮৬	২২	৭,০৩১.৩	২২,৮২৯.০	৬,৪৮৩.৬	১,২৭৫.১
২০০৬	৩১০	১২	১১,৮৪৩.৭	৩১,৫৪৪.৬	৬,৫০৬.৯	১,৩২১.৪
২০০৭	৩৫০	১৪	২১,৪৪৭.০	৭৪,২১৯.৬	৩২,২৮২.০	২,৩৩৬.০
২০০৮	৪১২	১২	৩৭,২১৫.৬	১০৪,৩৭৯.৯	৬৬,৭৯৬.৫	২,৩০৯.৪
২০০৯	৪১৫	১৮	৫২,২০৯.৯	১৯০,৩২২.৮	১৪৭,৫৩০.১	৩,৭৪৭.৫
২০১০	৪৪৫	১৮	৬৬,৪৩৪.০	৩৫০,৮০০.৬	৪০০,৯৯১.৩	৬,৮৭৭.৭
জুন'১০	৪৫০	৮	৬০,৭২৬.৩	২৭০,০৭৪.৫	১৬৫,৩২৪.৩	৫,১১১.৬

এপ্রিল'১১	৪৮৬	৫	৭৭,৮৪৬.০	২৭৭,২১৯.৩	১৫,৬২৮.৪	৬১৯৮.৮

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

নোটঃ ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ডিসএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০। মার্চ ২৮, ২০০৫ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক পুন:প্রবর্তন হয়।

ডিএসই-র সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক ২০১০ সালের জুন শেষে ৫,১১১.৬ ছিল যা এপ্রিল ২০১১ শেষে ২১.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬১৯৮.৮-এ দাঁড়িয়েছে।

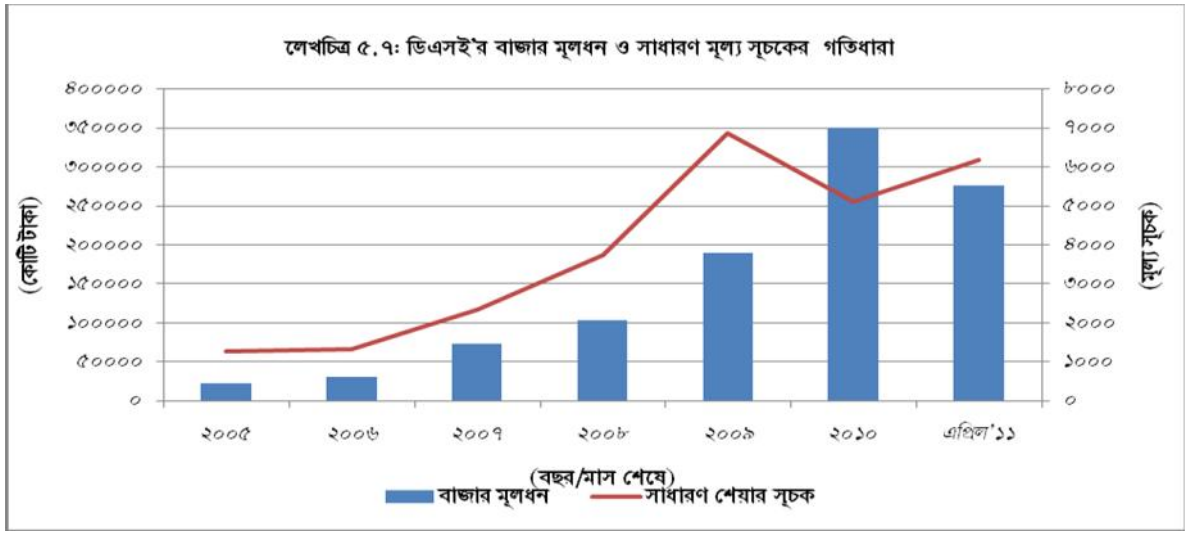

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০১০-এ ২৩২ থেকে বেড়ে এপ্রিল ২০১১ এ ২৩৪ টিতে দাঁড়িয়েছে। এ এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০১০ শেষে ২০,১১১.৬ কোটি টাকা থেকে ৪২.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এপ্রিল ২০১১ শেষে ২৮,৭৪৪.৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সিএসই'র সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ জুন ২০১০ এর ২৫৩,৪৩৯.৩ কোটি টাকা থেকে ১৩.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে এপ্রিল ২০১১-এ দাঁড়িয়েছে মোট ২১৯,৪৪৮.০ কোটি টাকায়।

সারণি ৫.৯: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২১০	১৬	৫,৫৫১.৯	২১,৯৯৪.৩	১,৪০৪.৩	৩,৩৭৮.৭
২০০৬	২১৩	৬	৬,৯৩৭.৯	২৭,০৫১.১	১,৫৮৯.৩	৩,৭২৪.৪
২০০৭	২২৭	১৩	৮,৯১৭.৪	৬১,২৫৮.০	৫,২৫৯.০	৭,৬৫৭.১
২০০৮	২৩৮	১২	১২,১৬০.৩	৮০,৭৬৮.৪	৯,৯৮০.৪	৮,৬৯২.৮
২০০৯	২১৭	১৮	১৫,৫১২.৫	১৪৭,০৮০.৭	১৬,২৫৬.৩	১৩,১৮১.৪
২০১০	২৩২	১৭	২০,৬৭৭.৪	২২৪,১৭৬.৮	২১,৭১১.২	২৩,৪৪৯.০
জুন'১০	২৩২	৭	২০,১১১.৬	২৫৩,৪৩৯.৩	১২,৯৫৬.৩	১৮,১১৬.১
এপ্রিল'১১	২৩৪	৬	২৮,৭৪৪.৭	২১৯,৪৪৮.০	১,৬৯০.৬	১৬,৯৪১.২

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

নোটঃ ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।
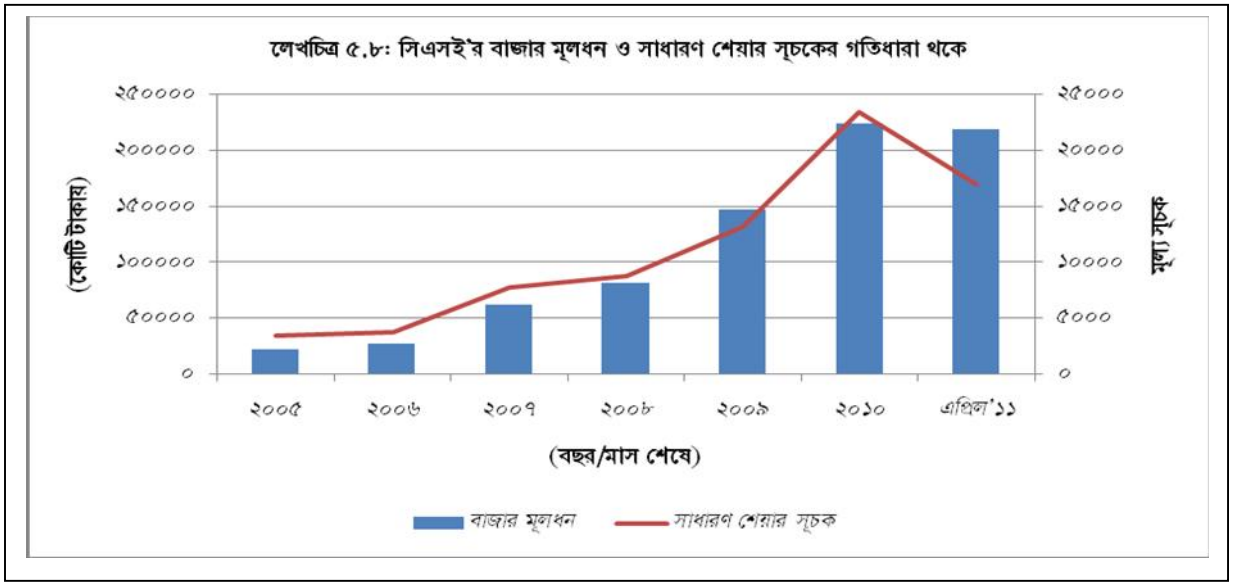
সিএসইর সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০১০ শেষে ছিল ১৮,১১৬.১, যা এপ্রিল ২০১১ শেষে ৬.৪৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬,৯৪১.২-এ। লেখচিত্র ৫.৮-এ ২০০৫ সাল থেকে সিএসইর বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচকের গতিধারা দেখানো হলো।